নকশাল বাড়ীর প্রভাবে
শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্র

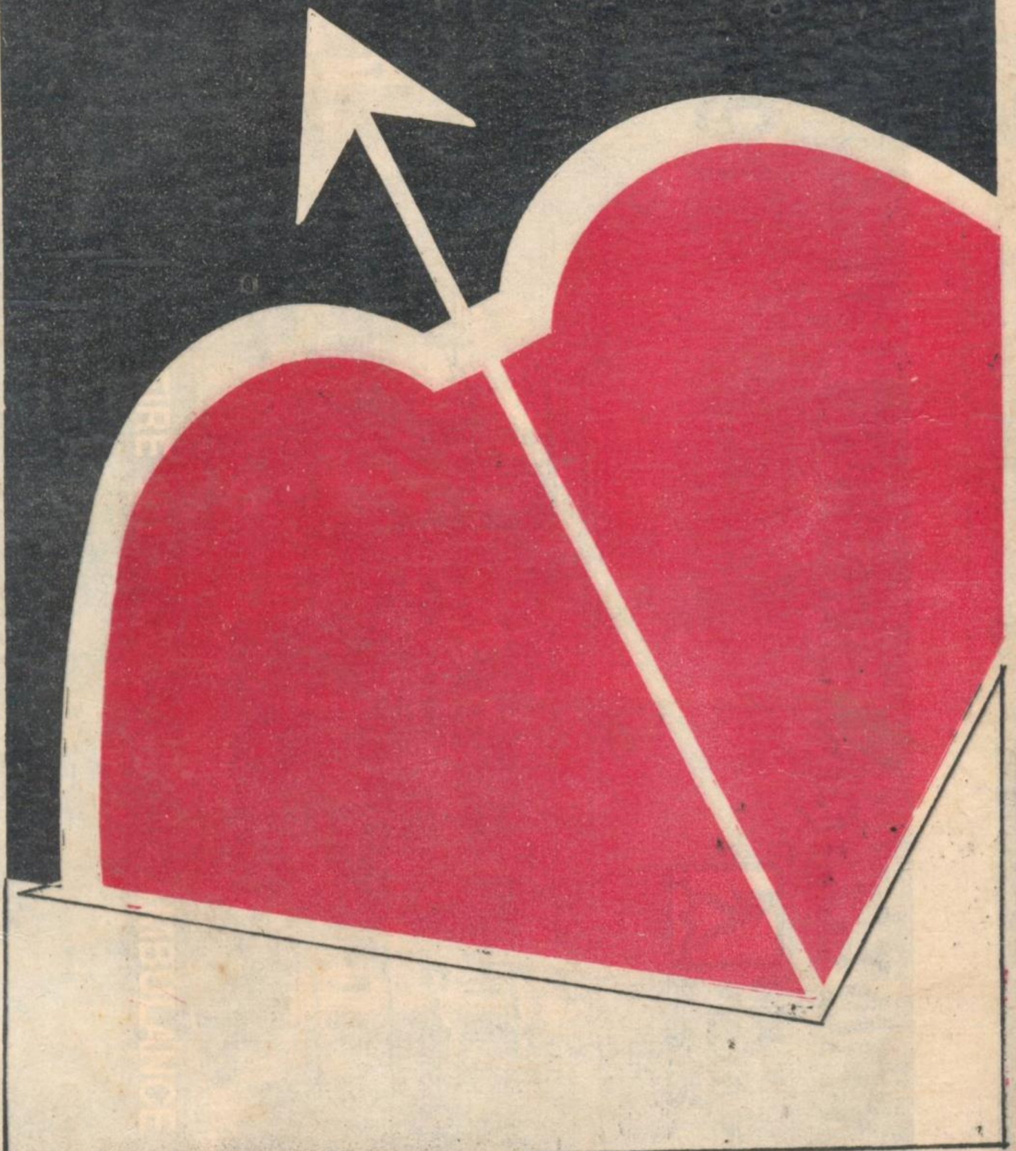

নকশাল বাড়ীর ধারা ও গণসঙ্গীত

—দিলীপ বাগচী

সমাজতথা সমাজ বিপ্লবের প্রতি দায়বদ্ধ শিল্পী, সাহিত্যিক—বুদ্ধিজীবী (এখানে বুদ্ধিজীবী বলতে গ্রামশ্চিত্ত প্রদত্ত বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী পরিচয়টাই মূলতঃ গ্রহণ যোগ্য)[১] সংগ্রামের ঘুমন্ত ও জাগ্রত, দুই অবস্থাতেই সক্রিয় থাকেন। এঁদের ভূমিকা কখনো সূত্রধারের, কখনো বিবেকের আবার কখনো বা চারণের। তবে সংগ্রাম চলা কালে এইসব সংস্কৃতি-কর্মী যতটা সক্রিয় ও সৃষ্টিশীল হন সেটা অন্যসময় ততটা দেখা যায় না। সামন্তবাদ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী

টীকা : ১—গ্রামশ্চির মতে, বিপ্লবী বুদ্ধিজীবি তাদেরকেই বলা হবে, শ্রমিক শ্রেণীর উন্মেষের সাথে সাথেই ঐ শ্রেণীর শ্রেণীগত পরিচয়, সামাজিক ভূমিকা, নিজ শ্রেণীর মধ্যে সমশ্রেণীত্ব বোধ সূত্রায়িত করে দেবার প্রয়োজনে তথা দায়িত্বে শ্রমিক শ্রেণীগত ভাবে যাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক শ্রেণীর সত্তার সাথে অঙ্গাঙ্গী মিশে থাকবেন। এই শ্রেণীগত বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনের কাজ তথা শ্রমের অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকেই প্রথম কর্মপরিচালনায় নেতৃত্ব দেবেন। এরপর ধীরে ধীরে ইতিহাসের মানবিক বোধ থেকে শ্রমজীবী মানুষের জীবনে অগ্রণী অর্থাৎ রাজনীতিগতভাবে নির্দেশক তথা নিয়ামকের ভূমিকা পালন করবেন। আন্দোলনের ভেতর দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী তার এই নিজস্ব শ্রেণীতে বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যে পূর্ববর্তী সমাজ ব্যবস্থার তথা সামন্ততান্ত্রিক বা ধনিকশ্রেণীর প্রতি প্রচ্ছন্ন আনুগত্য যুক্ত প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদেরকে তার পক্ষে টানবে। এই বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যই সমগ্র সমাজের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী তার মতাদর্শগত প্রচার করবে ও সেই মতাদর্শের পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন আদায় করবে। আন্তোনিও গ্রামশ্চি (১৮৯১—১৯৩৭) ইতালীর কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ। জেলখানায় বসে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'প্রিজন নোটস'এ-মার্কসবাদের বহুতত্ত্ব কথা লেখেন।

—লেখক

স্বাধীনতা সংগ্রাম গুলি থেকে শুরু করে অদ্যাবধি প্রতিটি আন্দোলন ও সংগ্রাম সংস্কৃতি কর্মীদেরকে সব নব নব সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। শিল্পীকে তাঁর দায়বদ্ধতার জন্য রাজনৈতিক তত্ত্ব নিখুঁতভাবে জানতেই হবে বা পার্টি সদস্য হতেই হবে, এসব কোন বাধ্য বাধকতা আরোপিত হলে তা শুধু হাস্যকরই হবে না, হবে ক্ষতিকর যান্ত্রিকতা প্রসূত এক ধরনের গোঁড়ামী যা মার্কসবাদ বিরোধী। তীতুমীরের সংগ্রাম, নীল বিদ্রোহ, সিরাজের পরাজয়. অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহ ইত্যাদি জনজীবনে তীব্র আলোড়ন জাগানো ঘটনা গুলি লোক শিল্পীদেরকে সংগ্রামের পাশে এসে তাঁদের গান-নাটক নিয়ে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছে। নিজে একজন মার্কসবাদী তথা পার্টি সদস্য না হয়েও, মার্কসবাদী দর্শন না পড়েও তীব্র মানবিক অনুভব থেকে এক নাম-না জানা অখ্যাত কবি গায়ক একটি বহু উচ্চারিত মার্কসবাদী তথা বিপ্লবী প্রত্যয়কে অনায়াসে সে তাঁর নিজের মত করে ব্যবহার করতে পারেন কি ভাবে তা, আমাদেরকে বিস্মিত করে। জন্মান্তরবাদের বিশ্বাসকে কিভাবে বিপ্লবের ধারাবাহিকতার বিশ্বাসে উত্তরিত করা যায় তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ সেই অজ্ঞাতনামা কবির গানে আমরা পাই, যখন তাঁর সেই গানটি একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।···দশমাস দশ দিন পরে /জন্ম নিব মাসীর ঘরে / (তখন) চিনতে যদি না পারিস মা/দেখবি গলায় ফাঁসী।" বিপ্লবীকে খুন করে, বিপ্লবকে শেষ করা যায় না, যায় না তার ধারা-বাহিকতাকে স্তব্ধ করা।

নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রামও এনেছে ভারতীয় গণ মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের ধারাবাহিকতার পথেই। তাই, বহমান বিপ্লবী সংস্কৃতির ওপর তার প্রভাব সঙ্গে সঙ্গেই পড়েছে। সংশোধন বাদের শ্রেণী সমঝোতার রাজনীতি থেকে জন্ম লাভ করা পৃথিবী ব্যাপী ক্লীব দের সংগ্রামের বর্জিত শান্তি আন্দোলন এদেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতির উপর স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাব ফেলে ছিল। গণসংগীত তার গণভিত্তি ভূমি থেকে উদ্বাস্তু হয়ে শহুরে বুদ্ধিজীবীর পেলব বাহুলতা ধরে তার ড্রইংরুমের আসবাব হ'য়ে যায়। ঐ সময়ের

জনপ্রিয় (অবশ্য এই জনগণ' শহরের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী জনগণ) গণ সঙ্গীতগুলির দু'এক কলি তুলে ধরলেই বুঝতে পারা যাবে এগুলির কান্ত কোমল পদের পদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সংগ্রাম হীন শান্তির ললিত বাণী, যার সাথে মেহনতী মানুষের জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক নেই তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতার। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ধরা যাক বিশ্বযুব উৎসব (পাঁচের দশক) উপলক্ষ্যে রচিত সেই বিখ্যাত 'নওজোয়ান / নও জোয়ান / বিশ্বে জেগেছে নও জোয়ান' গানটির এই ছত্র কটি, "যুদ্ধ ভয় সন্ত্রাসের, রক্ত পিপাসু দানবের / একতার হিম্মতের শাঙ্কি শপথে বলীয়ান!" তাবপর গায়ক সুবীর সেনের রেকর্ড কৃত সেই বিখ্যাত গান (ঐ সময়েই) 'ঐ উজ্জ্বল দিন' "আয়, আয়রে ছুটে আয়, / বাঁধন টুটে আনি, মুক্ত আলোর বন্যা / আয় সুপ্তি ভাঙ্গাই, আয় শান্তি জাগাই / এই শ্যামলী ধরনী হবে ধন্যা। // গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখার্জীর রেকর্ড করা 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা'র ছত্রকটি "হে কপোত, পারাবত পায়রা / যে দিকে দু'চোখ যায়, দেখা যায় যদ্দুর' / উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা / সূর্যের রোদ্রের উদ্দাম উল্লাসে / তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই-কেউ নেই / ওতে শুধু এক ঝাঁক পায়রা কিন্তু এই সম্মেলনে সমবেত হয়ে / গাই জীবনের জয়গান / ভাসে স্বপ্নেরঙ্গীন, ঐ শান্তির দিন / !" সত্যিই প্রায় দেড় দেড় দশক ধরে 'তুমি নেই আমি নেই', সংগ্রাম নেই, শুধু শান্তির পায়রা উড়ছে আর সংস্কৃতির বাস্তুতে ঘুঘু হ'য়ে বস্‌ছে। হেমাঙ্গ দা, আর পরেশ দা, (ধর) সলিল চৌধুরীর মত প্রতিষ্ঠিত গণসঙ্গীত শ্রষ্টারাও তখন শান্তির পায়রার পালক সংগ্রহে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। কি করা যাবে? পার্টি লাইন/পরেশ দা ও আরো কারো কারো মনে এই ধরণের বিষয় নির্বাচন নিয়ে যে দ্বন্দ্ব ছিল তা 'সাংস্কৃতিক সমসময়ে' পরেশদা'র ধারাবাহিক রচনায় মিলছে বটে, কিন্তু সেই সময়ে তা জানা যায়নি মফঃস্বলে এর পরিনাম হ'ল এটাই যে কেরালার প্রথম নির্বাচিত কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত রাজ্য সরকারকে নগ্ন চক্রান্ত মূলে গায়ের জোরে যখন উৎখাত করা হ'ল, তখন তার প্রতিবাদে কোন গণসঙ্গীত

পাওয়া গেল না। আবার ১৯৫৯ এর সেই উত্তাল খাখ আন্দোলনে ৩১ শে 'আগষ্ট ৫৯ জন কৃষক আন্দোলনকারী গুলিতে প্রাণ দিলেন, তখানো শান্তির মোহময়ী আশ্রয় থেকে কোনও অগ্নিশ্রাবী গণসঙ্গীত বেরিয়ে এল না। ঐ আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য আমরা গ্রামাঞ্চলে তখন তেভাগার সময়ের গানগুলি—যথা 'আজি বাংলার বুকে দারুণ হাহাকার', হেই সামালো ধান্ হো', ইত্যাদি গেয়েছি। শান্তি আন্দোলনের আবহাওয়া কিন্তু তখন তীব্র সংকট জর্জরিত ও অত্যাচারিত গ্রাম বংলায় কোনও প্রভাব ফেলতে পারে নি। আমরা মফঃস্বলের গ্রামের গণসঙ্গীত রচয়িতারা ও গায়করা শান্তির গান রচনা করতে বা গাইতে পারিনি গ্রামীন জনতার কাছে। ঐ সময়ে এই নিবন্ধকার একটু 'বিপথ গামী' হ'য়ে 'একতারার গান রচনা করেন। তার কয়েকটি ছত্র, আমাদের একতারার এই একটি তারে / বাঁধা আছে / কোটি লোকের একটি চাওয়া একটি পাওয়ার গান / সুখ চাই শান্তি চাই / মানুষের মত বাঁচতে চাই / সে সাধে বাদ সাধে যে / তার বিরোধী মোদের অভিযান //' এই গানটি তৎকালে গণনাট্য সংঘের সেন্ট্রাল টিমের গানের লিডিং গায়কের কাছে নিয়ে গেলে তিনি বললেন, যে ওটা নাকি একটা গানই হয়নি। যদিও নদীয়া মুর্শিদাবাদের গাঁয়ে গাঁয়ে শ্রমজীবী মানুষ গানটিকে খুবই পছন্দ করতেন।

এমনি এক বন্ধ্যাত্বের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে এল ১৯৬২ সাল। ভারতের চীন যুদ্ধের সময় গ্রেপ্তার হলেন শত শত কমিউনিষ্ট নেতা-কর্মী ভারত রক্ষা আইনের নানাবিধ বেআইনী প্রতিহিংসাত্মক প্রয়োগে। আঘাতে খসে গেল শান্তির পায়রার পালকগুলি, বেরিয়ে এল হিংস্র শকুন। প্রতিক্রিয়ায় জ্বলে উঠলেন গণসঙ্গীতকাররা। ওদিকে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের তীব্রতা নৃশংস নির্মমতার বিরুদ্ধে ক্রমশঃ জয়ী হচ্ছেন বীর সাহসী ভিয়েৎনামী জনগণ। কলকাতার পরিধির বাইরে মফস্বংলের গণসঙ্গীত কাররাও উৎসাহের আগুনে জ্বলে উঠলেন এই নিবন্ধকার সে সময় বহরমপুর জেলে রচনা করলেন (পাঞ্জাবী

ভাংড়ার আঙ্গিকে), "যারা শৃংখল ভেঙ্গে দেশ করছে স্বাধীন", যার কটিছত্র, "ডাকে বিগত শতাব্দীর সিপাহী সেনা, / ডাকে ক্ষুদিরামের রাঙ্গা রক্তকনা, / বিদ্রোহী চট্টল হাতছানি দেয়, / ডাকে কায়ুর শহীদ ডাকে তেলেঙ্গানা ! / না, না, মানবো না, / হানবো হাতের শেষ হাতিয়ার, / (মিছে) শান্তির কান্না তো কাঁদবো না, / অহিংস শকুনির হিংস্র নখর, / কাটবো, মোরা আর শুনবো না ! "জেল থেকে গান বেরিয়ে এসে মফঃস্বলের শহরে গ্রামে জনপ্রিয়তা পেল। অজিত (পাণ্ডে) লিখলেন," কৃষ্ণে কি আর কংস কারায় বেঁধে রাখা যায় ? / মাঠে মাঠে লক্ষ কৃষ্ণ অগ্নি বাঁশের বাঁশী বাজায়। "—দারুণ জনপ্রিয় হল" মুর্শিদাবাদের সীমা পেরিয়ে গোটা পশ্চিম বাংলায় ছড়িয়ে গেল। অজিতের আর একটি গানও তখন ছাত্র-যুবমহলে দারুণ সাড়া পেয়ে, যদিও তাতে শান্তির ভূত ছিল, তবুও ভিয়েৎনামের সংগ্রাম শান্তিকে ছাপিয়ে উঠেছিল গানটিতে, "লক্ষ কণ্ঠে গর্জে উঠেছে. মুক্তি চাই," / লক্ষ প্রাণের দৃপ্ত ঘোষণা 'শান্তি চাই.' / মুক্তি চাই, শান্তি চাই, মুক্তি চাই / মোরা মুক্তি চাই /" ১৯৬৮ সালে দার্জিলিং জেলে থাকার সময় সাথী বুদ্ধিমান বানতাওয়ার সহযোগিতায় বর্তমান নিবন্ধকার এটির নেপালী অনুবাদে 'শান্তি' গুলো 'ক্রান্তি' বানিয়ে দেন, "লাখোই কণ্ঠ মা গর্জে উঠয়ো মুক্তি চাহাছৌ……মুক্তি, ক্রান্তি, শান্তি, হামিলে ক্রান্তি চাহাছৌ !" ঐ সময়ের আর একটি গান, "ভাগীরথী তুমি মেকং নদীর সীমানা ভাচো / খবর আনো"। যাই হোক মোদ্দা কথা শান্তির ঘুম ভাঙ্গাতে থাকল। এল সেই উদ্দাম উত্তাল ৬৬-র খাদ্য আন্দোলন। গণসঙ্গীত রচিত হল, "ও নুরুলের মা"। এর আগে ছাত্র ভূদেব সেনের মৃত্যুতে রচিত হ'ল, "মাংস চাই"। প্রতিষ্ঠিত গণসঙ্গীতকাররা, প্রায় স্তব্ধ এই উত্তাল সময়ে। সলিল চৌধুরী অনেক আগেই বম্বে চলে গেছেন। ভূপেন হাজারিকা তাঁর "ভারতের সীমানায়" গানের কথা "চীনের জনতার জয়ধ্বনি শুনি" অংশ পাল্টে ফেললেন—পাছে পুলিশ তাঁকে চীনপন্থী বলে ঝামেলা করে। ঐ স্থানে লেখা হ'ল "গাঁয়ের সীমানায়"

"নিশীথ রাত্রির প্রতিধ্বনি শুনি।" ঐ সময়ে নিবন্ধকারের ব্যঙ্গ গান "চীন চীনিয়া রোগেতে ভাই ধুঁকছে দেশের মন প্রাণ / (তাই) জান ঠেকাতে মান বাঁচাতে দেশ প্রেমের বান ডাককান ! /" রচিত হয়। হেমাঙ্গ দা' এই সময় বেশ কিছু বিদেশী গান অনুবাদ করেন সেগুলির সুর বজায় রেখে ! সেগুলি অবশ্য শহরে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের গণ্ডি পেরিয়ে মফঃস্বলে আসে নি। বুর্জোয়া প্রশাসনের মত আমাদের দেশে বিপ্লবের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করত ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্যও কলকাতাকে প্রাণকেন্দ্র না করলে চলে না ! কলকাতার হেড অফিস থেকে কৃষক আন্দোলনের বা কৃষি বিপ্লবের বড় বাবুরা গ্রামের কৃষক ফ্রন্টের নেপাল-গোপালদেরকে নির্দেশ পাঠান, 'কি করিতে হইবে।' বিস্তৃত ব্যাপক গ্রামগঞ্জের মানুষ নন, কলকাতার বাবু কমরেডরা গণসঙ্গীতের সার্থকতা তথা যোগ্যতা বিচার করবেন, কাগজে কাগজে সেই সব পরিশীলিত গণসঙ্গীতের প্রশংসা বেরুবে--তবেই তা গণসঙ্গীত হবে।

ধারাবাহিকতার পশ্চাৎভূমিটার বিবরণ খুব সংক্ষেপে সারতে হল, ফলে বিস্তারিত বিবরণ বা তথ্যের অপূর্ণতা থেকেই যাবে। আমাদের আলোচ্য বিষয়টাও সে সময় নয়। তবে কিনা এমনটাই চলে আসছিল। হয়তো চলতোও। রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেস থেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে যে মতাদর্শগত সংঘাতের মাধ্যমে সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রাম শুরু হ'ল, তার তরঙ্গাভিঘাত এবং সবশেষে ভারতের চীন যুদ্ধ এদেশেও দায়বদ্ধ সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করল। যদিও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে লড়াই শুরু হয়েছিল দিল্লীর 'রামলীলা ময়দানে' ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় সম্মেলনের মঞ্চে। সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর অনুমোদিত সংস্থা হবে কিনা এই প্রশ্নই নীতিগত ভাবে বিভাজন ঘটে গেল সে সময়। পরবর্তীকালেও দেখা গেছে যে পার্টির বড় কর্তাদের সংস্কৃতি বিষয়ে কোন চিন্তা ভাবনা ছিল না, ফলে রাজনৈতিক পথ প্রদর্শনেরও কোনও প্রশ্ন ছিল না। বরং

বিপরীত ক্রমে ওঁরা সগৌরবে বলতেন যে তাঁরা 'কালচার, ফালচার' বোঝেন না। নিবন্ধকার একবার (ছয়ের দশকে) এক বড়মাপের নেতাকে বলতে শুনেছেন, "ওসব নাচ-গান হিজড়েদের ব্যাপার। নাটক করে আবার দেশে বিপ্লব হয়েছে ?" 'হোপ-৮৬' 'আলোকের ঝর্ণাধারা' মার্কা 'বৈপ্লবিক' সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর পিছনে পূর্বোক্ত মানসিকতারই ধারাবাহিকতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

নতুন করে সি পি এম দল গঠনের প্রক্রিয়ার মুখেই নিবন্ধকারসহ পশ্চিম বাংলার বহু কর্মীর মনেই সন্দেহ ছিল যে ধাপ্পার আড়ালে একটি নয়া সংশোধনবাদী দল তৈরী হতে চলেছে। কাজেই পার্টির মধ্যে সমমনস্ক সাথী খোঁজা আরম্ভ হল—সেই ১৯৬৩-র শেষ দিক থেকেই, খুবই সন্তর্পণে। '৬৬র খাদ্য আন্দোলনের চাপে নেতারা সব জেলের বাইরে এলেন। মূল্য বৃদ্ধি ও গণ অসন্তোষ দমনে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ফলে ভারত চীন ও ভারত-পাক যুদ্ধের কৃত্রিম দেশপ্রেমের রেশ দ্রুত কেটে গেল। আন্দোলন শহীদত্ব—বন্দীজীবনের ডিভিডেণ্ড আদায়ের জন্য 'বুলেটের জবাব ব্যালটে' দেবার জিগির দিয়ে নামা হল ১৯৬৭-র নির্বাচনে। 'জনগণের ইচ্ছায়' (!) পাল্‌ফ (PULE) আর আল্‌ফ (ULF) এর দুই আলাদা মঞ্চে কংগ্রেস বিরোধীরা লড়লেন। ভোটের পর দেখা গেল কোনও পক্ষই সংখ্যাগরিষ্ঠ নন। তখন আবার জনগণের ইচ্ছায়' (?!) দুই মঞ্চ মিলিত হয়ে তৈরী হল 'যুক্তফ্রন্ট সরকার, অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরী হল উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতাদের বহুদিনের না মেটা সাধ পূরণের জন্য, রাজা সাজার জন্য।

এরপর এল মে মাসের শেষ সপ্তাহের সেই রক্তাক্ত দিন, তথাকথিক চীনপন্থী (সি, পি, এম যারা গঠন করেছিলেন তাঁরা তখন জনসমক্ষে ঐ পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন) কমিউনিষ্ট নেতাদের সরকার ভূমিষ্ঠ হয়েই কৃষকের রক্তে হাত রাঙ্গালো। সংস্কৃতির জগতে পূর্ববর্ণিত পথে যে নান্দীমুখ হয়েছিল তার মৃদু ক্রিয়া প্রক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল। নকশালবাড়ীর ঘটনার দিনই রাত্রে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসে (নিবন্ধকার তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র

ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক) নিবন্ধকার লিখলেন উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর কথ্য ভাষায়, তাঁদেরই কৃষ্টি বাহিত সুরে, "ও নকশাল নকশাল, নকশাল বাড়ির মা, / ও মা তোর বুগোৎ অক্ত ঝরে, / সেই অক্ত আঙ্গা নিশান লয়্যা / বাংলার চাষী জয়ের ধ্বনি করে / ··· (ও মারে) তোর অক্ত হইতে শিখাহ পাছি / হামরা দেশের চাষী / হাত বদলৎ বদলায় নারে / হামার গলায় ফাঁসী মারে।" রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ব্রাত্য বলে পরিগণিত ও চির অবহেলিত গ্রাম বাংলা এক ঝটকায় চলে এলো পাদপ্রদীপের আলোয়। শহুরে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী রাজনীতিকরা কিছু দিনের জন্য বাধ্য হলেন এই নেতৃত্বকে মেনে নিতে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অখ্যাত গণশিল্পীরা শাসন করতে লাগলেন সংস্কৃতির জগৎ। উৎপল দত্ত নকশালবাড়ির পটভূমিতে রচিত তাঁর তীর নাটকের উপাদান সংগ্রহার্থে নকশালবাড়ি ঘোরার পথে এলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠের জনসভায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাচনভঙ্গীতে বললেন, "একদিকে নকশালবাড়ি, আর একদিকে বেশ্যাবাড়ি। মাঝখানে গভীর নোংরা পাঁকের গাড্ডা। আজ ঠিক করে বেছে নিতে হবে শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদেরকে, তাঁরা কোন বাড়ীতে উঠবেন।" আশা করা যায় নাট্যকার উৎপল দত্ত ঠিক বাড়িতে উঠেছিলেন। এখনো সেই বাড়ীতেই আছেন তো? ওঁর সাথে সেদিন ছিলেন আলোক শিল্পী তাপস সেন ও মঞ্চ বিশেষজ্ঞ নির্মল গুহরায়। পরবর্তীতে নাটকের ক্ষেত্রে ঘটল যুগান্তকারী পরিবর্তন। কৃষি বিপ্লবের প্রতি দায়বদ্ধ প্রচুর একাঙ্ক নাটক লেখা হল। নাটকের অভিনয় মঞ্চ থেকে মাঠে নেমে এল, রূপসজ্জা ও মঞ্চসজ্জা প্রায় ছাড়া অবস্থায় বলাই ভাল। নব নব আঙ্গিকের পরীক্ষা চলল।

বর্তমান নিবন্ধকার ছাড়া নকশালবাড়ীর সংগ্রামে তথা পূর্বোক্ত ধারাবাহিকতার ফসলে উদ্বুদ্ধ গণসঙ্গীত রচয়িতারা এত প্রচুর গান লিখেছেন যে তার হিসেব দেওয়া শক্ত। আবার ধারণা করা যেতে পারে যে নকশালবাড়ীর ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র গণনাট্য যুগে যা গান

লেখা হয়েছে, নকশালবাড়ি ঘটার পর বছর দুয়েকের মধ্যেই তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী গণসঙ্গীত রচিত হয়েছে। ঐ বছর ১৯৬৭ নভেম্বর মাস পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণশিল্পীরা শতাধিক গান বাঁধেন। এঁদের মধ্যে যাঁদের নাম মনে আছে তাঁরা হলেন শিলিগুড়ির প্রবীর (?) বল (প্রয়াত), মুর্শিদাবাদের শ্যামসুন্দর বোস, অজিত পাণ্ডে, অগুরু সরকার, অলক সান্যাল, কলকাতার প্রতুল মুখার্জী, কমলেশ সরকার, বিপুল চক্রবর্তী, নদীয়ার নীতিশ রায় ইত্যাদি। সবার নাম আজো জানিনা।

নকশালবাড়ী ধারার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখা গানগুলি দু' রকমের এবং দু'টি পর্বের। প্রথম রকম হচ্ছে সাধারণভাবে গণচিত্ত উদ্বুদ্ধকারী গান এবং দ্বিতীয় রকম হচ্ছে রাজনৈতিক বক্তব্য সমৃদ্ধ গান। পর্ব দুটি হল (১) সংগ্রাম চলাকালীন পর্ব ও (২) বন্দীমুক্তি পর্ব। যে গানের দলগুলি উভয় পর্বে নিবেদিত ভাবে কাজ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অপেরা গ্রুপ' (অজিত পাণ্ডেরা ছিলেন এই গ্রুপে), 'অয়ণি গোষ্ঠী (অমিতেশ সরকাররা ছিলেন এখানে), 'নিশান্তিকা' (রমেন সাহা, মানব সেন, পার্থ সেন, পার্থ ব্যানার্জী, স্বপন দাশগুপ্তরা ছিলেন এই গোষ্ঠীতে), 'গণ বিষাণ' (জেলি বাগচী, পাখি রায় প্রমুখরা), 'এজিট-প্রপ' ইত্যাদি। নিশ্চয়ই আরো বেশ কিছু গোষ্ঠী ছিল। তবে আগেই বলেছি সবার নাম জানা নেই, অনেকের নাম মনে নেই। স্মৃতির বিচ্যুতি বা ভ্রান্তি, অতএব, ক্ষমার্হ। এসব ইতিহাস এক্ষুনি সংগ্রহ করা দরকার। নইলে দেরীতে সব হারিয়ে যাবে। গ্রুপ ছাড়াও একক গায়ক ও রচয়িতা হিসাবে আর যাঁরা স্মরণীয় তাঁরা হলেন সুরেশ বিশ্বাস, পৃথ্বীশ দাশগুপ্ত (স্বামী-স্ত্রী) ওরফে মেঘনাদ, অলক সান্যাল প্রমুখ। যাঁদের নাম উল্লেখ করা হ'ল তাঁরা নিবন্ধকারের কর্মক্ষেত্র যে সব জেলা, সে সব জেলার শহর ও প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত গেছেন ও জনপ্রিয় হয়েছে তাঁদের বেশ কিছু গান।

সংগ্রামী পর্বের জনপ্রিয় গানগুলির কিছু স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে দিচ্ছি। নকশালবাড়ি নিয়ে প্রথম গানটির কথা আগেই উল্লেখ করা

হয়েছে। ঐ পর্বে নিবন্ধকারের লেখা ও সুর দেওয়া অন্য একটি গান, "হিমালয়ের সোনা গলা জলের ছোঁয়ায় ফসল দোলে," "নভেম্বরের ডাক শোনো / কাঁধে নাও রক্ত নিশান," "আজ যে দিবস, শ্রমিকের রক্তস্নান / অস্ত্রে অস্ত্রে সব হারার মুক্তির ঐ আহ্বান," "আয়! আয়! আয়! আয়, নতুন দিনের গান গাই / দুনিয়াটা ভেঙ্গে সাজাই," "মন চল্যাচ্ছে শুশুনিয়া পাহাড়ে /…পলাশ আগুন ছড়ায় / পাহাড়ের চুড়ায় চুড়ায় / তমাসে ধারা পরব / ফুল আজে জেহেলে / লাল লিশান লিয়ে বল, ডাকবে সে আজ কাহারে ?"—ইত্যাদি। এছাড়া কিছু ব্যঙ্গ গানও তাঁর রচিত হয়েছিল ঐ সময়। তার কিছু কিছু নমুনা : "যেন কচু, আলু আর আদা মিশে হয় কচ্‌ম্বাদা / (তেমনি) সাড়ে পনের পার্টি মিলে যুক্তফ্রন্টি, দাদা / ছা রা রা ভোট দিয়ে যা /… আমাদের যুক্তফ্রন্টের বাজারে ভাই পাবে সব রকম / খদ্দর থেকে গো হত্যা বন্ধ / লড়াই নরম গরম / কোনটা চাই তোমাদের ?" "আমাদের ভোট দিবি কি দিবি না / আমরা যুক্তফ্রন্টের শেঁৎকা চার জনা! /… আমরা করবো দখল পুলিশ মিলিটারী, / (আর) ভোটে জিতে কোর্ট আর কাছারী, / (তখন) জনযুদ্ধ করবে পুলিশ, / জনগণ আর লাগবে না! /" এবং "ও তোর কিসের গোঁসা হলুরে, / যুক্তফ্রন্টের মার্কশিষ্টরে /…আরে, বিপ্লব সময় কালে (রে) / আরে ওরে, মাও সে তুঙ্‌এর গুরু মারা চেলা, / উড়িয়া গিরির ঘরে বৈস,/কর বেহা বেহা খেলা (রে)!" অন্য যেসব গান গেয়েছি ও শুনে ভাল লেগেছে ও মনে আছে সেগুলো উল্লেখ করছি রচয়িতার নাম ছাড়াই, কারণ সঠিক সব জানা নেই। "আগুন লেগেছে অগ্নিঝড় / কখনো এখানে, কখনো সেখানে / কাকদ্বীপ থেকে তেলেঙ্গানা / ছোটনাগপুর, নকশালবাড়ী, সাঁওতাল পরগণা!" "মাগো তোমার বুকে করল যে খুন / তাই আমার বুকে জলে আগুন," "কিসের ভয় সাহসী মন লাল ফৌজের, / লাফিয়ে হই পার!" "নকশালের ডাক, সর্বহারার ডাক /… দেখো কমরেড! ভিয়েৎ-নাম থেকে / বর্মা মালয় তরাইয়েও মুক্তি সেনার ঝাঁক ? "মুক্তি সেনানী আগুয়ান / দুর্বার দুর্জয় নির্ভীক! / সর্বহারা সৈনিক তুলে ধরে

বেয়নেট / হাঁক দেয়, 'কমরেড, সাবধান' !" "পাহাড়ে আগুন লেগেছে, আগুন / নকশাল থেকে শ্রীকাকুলামের পাহাড়ে জঙ্গলে / আগুন লেগেছে, মুক্তির ঐ লাল আগুন, / ইয়েনানের আগুন !" এই গান গুলি বাদেও চার ও পাঁচের দশকের কিছু গান ও যেগুলির সংগ্রামী প্রাসঙ্গিকতা ছিল সেগুলিও বহু গেয়েছি। যথা, "শোনো গো দূরের পথিক," "উঠা হৈ তুফান জমানা বদল রহা /...এক চীন বনায়া, অব তো সাথী, / লাখোঁ চীন বনেঙ্গে / আগ সে আগ বঢ়েঙ্গে / অব তো দীপ সে দীপ জলেঙ্গে /," "ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না/নিগ্রো ভাই আমার পল রোবসন !" "বলিষ্ঠ দুই হাতে তুলে নাও হাতিয়ার / রক্তের নিশান ওড়াও ! / মহাচীন আর বার্মার পথে আজ / মুক্তির কদম বাড়াও !"—ইত্যাদি।

ঐ পর্বের অন্যগান যা শুনেছি ও ভাল লেগেছে অনেকের, সেগুলি হচ্ছে 'বোকা বুড়ার পাঁচালী' ও 'কবির লড়াই' (সহজ সরল ভাষায় এত সুন্দর তাত্ত্বিক অথচ জনপ্রিয় গান খুবই কম শুনেছি)।

বন্দীমুক্তিপর্বের গানগুলি জনমানসে অনেক বেশী আবেদন জাগিয়েছিল। অবশ্য, ঐ গানগুলি প্রকাশ্য সমাবেশে সর্বত্র গাওয়া হত অনেক বেশী। এগুলির মধ্যে "সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি চাই / ওরা ক্ষুদিরামের ভাই ওরা ভগৎসিংয়ের ভাই, "মোরা চাইরে চাইরে চাই, সমস্ত রাজবন্দীর চাই আজ মুক্তি," "এই তপ্ত অশ্রু দিক শক্তি / এই শোকের আগুন / জ্বালাক দ্বিগুণ / চিরশত্রুর প্রতি ঘৃণার আগুন, / জ্বলুক, জ্বলুক দাবানল !" "শত শহীদের রক্তে রাঙ্গা পতাকা"—ইত্যাদি। এগুলির সাথে হেমাঙ্গদার "আমরা তো ভুলি নাই শহীদ" ও দু দশক পর প্রাসঙ্গিকতা পায়। নকশালবাড়ির সংগ্রামী ধারার বাহক গণসঙ্গীত শিল্পীদের আজো তাঁদের সৃষ্টি কর্ম মোটামুটি অক্ষুন্ন রেখেছেন। কেউ কেউ লোক সঙ্গীত সংগ্রহ ও গবেষণার দিকে বাঁক নিয়েছেন। অজিত পাণ্ডে বহু আগেই রাজনীতিগত ভাবে অন্য শিবিরে চলে গেলেও পুরানো সম্পর্কগুলিকে চোখ বুঁজে ঝেড়ে মুছে ফেলেন নি। অজিত পাণ্ডে ছাড়াও গানের ক্যাসেট বের করেছেন

মেঘনাদ, সুরেশ দা (বিশ্বাস), বিপুল চক্রবর্তী (স্ত্রী অনুশ্রী সহ) ও অলক সান্যাল। অন্য কারো বেরিয়েছে কিনা জানা নেই। প্রাতিষ্ঠানিক বামপন্থীরা গণসঙ্গীত থেকে সাঙ্গীতিক না হ'লেও বাণিজ্যিক লাভ করছেন ক্যাসেট বিক্রী করে। কোনো কোনো চতুর ব্যবসায়ী বুদ্ধি সম্পন্ন 'শিল্পী' (?!) গণসঙ্গীতকারের নাম ও সঙ্গীতের মূল অংশ ছাঁটাই করে (উদাহরণ—'থাকিলে ডোবা খানা') তাকে 'লোকসঙ্গীত' বলে বাজারে চালিয়ে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ 'গণসঙ্গীত সংগ্রহ' প্রকাশ করেছেন বিরাট দামী বই (টাঃ ১০০) আকারে, যদিও সঙ্গীত রচয়িতাদের অনুমতি নেওয়া বা তাঁদেরকে অন্ততঃ একখণ্ড বই দেবার মত সৌজন্য বোধ ব্যতীতই! গণসঙ্গীত অবশ্যই জনগণের সম্পদ। তবু সেটা যখন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হচ্ছে, তখন কি সঙ্গীত রচয়িতারা সংগ্রাহক সুব্রত রুদ্রর কাছ থেকে একখণ্ড বই প্রত্যাশা করলে সেটা অন্যায় প্রত্যাশা হবে? যদিও ঐ সংগ্রহের জন্য সুব্রত বাবু, কিছু ত্রুটি (গীতিকার সুরকার পরিচিতি, রচনাকাল ইত্যাদির অভাব) সত্ত্বেও, প্রশংসাই পাবেন।

নকশালবাড়ী পর্যায়ের গানগুলির সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে বেশীর ভাগ গানের গীতিকবিতায় জনজীবনের ও জনমানসের উপস্থিতি ক্ষীণতম বা নেই বললেই চলে। গানগুলির বেশীরভাগই হ'ল নৈর্ব্যক্তিক ভাবে সংগ্রামে উদ্দীপ্ত হবার আহ্বান। গীতি কবিতাগুলির অনুভবের জায়গাগুলি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি মনের মনন প্রক্রিয়ার জায়গা। তেভাগার সময়ের গানগুলির মধ্যেও বহু ক্ষেত্রে এই ঘাটতি চোখে পড়ে। ব্যতিক্রম মফঃস্বলের গ্রামীণ কবি গায়করা। এই ত্রুটির অন্যতম কারণ হচ্ছে জনজীবনের সাথে একাত্মতা (integrity)-অভাব। এর জন্য মূলতঃ দায়ী তৎকালীন ভ্রান্ত রণকৌশল। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শত শত কর্মী গ্রামে গেছেন যথেষ্ট আগ্রহ, ঐকান্তিকতা ও নিবেদিত প্রাণতা নিয়ে। তাঁরা নিজেদের পূর্বগৃহীত সূত্রের মধ্যে যান্ত্রিক-ভাবে গ্রামীণ মানুষের মানসিকতা ও চাহিদাকে ধরতে চেয়েছেন। ফলে জনগণের মনন প্রক্রিয়া ও সমাজ-মানসিক গঠনকে তাঁরা ধরতে পারেন

নি। বরং বলা, যায়, বিপরীত ক্রমে তাঁরা নিজেদের ধারণা ও সিদ্ধান্ত গুলিকে জনগণকে গ্রহণ করাতে অথবা জনগণের চিন্তা বলে মেনে নিতে (এমন কি নিজেদেরকেও) বাধ্য করেছেন। এগুলো যে ভুল কাজ হচ্ছে এটা বুঝবার মত অবস্থান ও অবস্থা তখন তাঁদের ছিলনা। এক কথায় বলা যায় যে গণ কার্যকলাপের অভাবের দরুণ জনজীবনের সাথে অনন্ত ক্রিয়া সংঘটিত না হবার ফলে এগুলি ঘটেছে। তবুও কিছু গণসঙ্গীত রচয়িতা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেও জনজীবনের উত্তাপকে কিছুটা ধরতে পেরেছিলেন। তাই সামান্য কিছু গানে সেই সব জীবনের জীবন্ত ছায়া ধরা পড়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, "জারে কাঁইপছে আমার গা," "চাসনালা খনিতে," "ধ্যেৎ তেরিকা," "সুবর্ণরেখার সোনা সোনা জলে," "জন চল্যাছে সুসুনিয়া পাহাড়ে, হঁ বটে," "কইলকাতা শহরে, সিদু কানু ডহরে," "গিরিবালা নাক বিঁধালো," "ঝিম্ ঝিম নেশা লাগে," "দূরে দূরে বন ধারে," অলক সান্যালের রেললাইন অবরোধ নিয়ে রচিত গান, ইত্যাদি। তবে প্রসঙ্গতঃ এটাও বলা যায় গর্বের সঙ্গে যে, এ ধরণের জীবন রস সম্পৃক্ত গান এত অধিক সংখ্যায় অন্য কোনও সময়ে (নকশালবাড়ীর ঘটনার আগের পর্বে) লেখা হয় নি। সি, পি, এম-সি' পি, আই-এর সংস্কৃতি ফ্রন্ট কিন্তু ১৯৬৭ পূর্ব সময়ের চেয়েও পিছিয়ে গেছে, বলা যায় সেই শান্তির যুগে। কারণ চোখের মনের মত আদরণীয় বামফ্রন্ট সরকারকে বিপদে ফেলতে পারে এমন গান গাওয়া উচিত নয়! ফলে গণতন্ত্রের ধাপ্পা ও তার অসারতা, জনগণের জীবনের দুঃসহ অবস্থা, রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক সন্ত্রাস ইত্যাদি বিষয়ে গান লেখা ও গাওয়া চলবে না, পাছে উলঙ্গ রাজা ধরা পড়ে যায়! ওঁদের গানের দলগুলি যে সব গান গায় (এমন কি কিছু 'নির্দোষ' পুরানো গণসঙ্গীতে), সেগুলি শুনে অনেক সময় বোঝাও যায় না যে এটা কোনও দ্বিজেন্দ্র গীতি, না রবীন্দ্র সঙ্গীত, না আধুনিক গান, না নির্ভেজাল পল্লী গীতি, না অন্য কিছু। কারণ সেই একই, জনগণ সম্পর্কে আগে থেকে ঠিক করে রাখা ধারণা, জনগণের ঘাড়ে, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নামে

চাপিয়ে দেওয়া হয়, যদিও মুখে বলা হয় ওটাই জনগণের মনোভাব! ফলে ঐসব গান জনগণ তো গ্রহণ করেনই না, উপরন্তু এমন একটা সময় আসে, যখন পার্টি ম্যাণ্ডেট ছাড়া দলের সাথীরাও ঐসব গান আর শুনতে চান না! শ্রোতারা একটু খেয়াল করলেই ধরতে পারবেন যে, ঐ ধরণের নকশাল অ-নকশাল নির্বিশেষে তাবৎ গানের বক্তব্যই এক ও হয়তো বিভিন্ন শব্দের নানারকম ভিন্ন ভিন্ন সমার্থক শব্দে ও শব্দের স্থান বদলে যেটুকু আলাদা মনে হয়। এগুলির রূপকল্প ব্যবহারও প্রায় এক রকম, কাজেই সব দিক থেকে একঘেয়ে। সেই এক কথা—"এস ভাই, সব চাষী মজুর এক হও, যার যার নিজের হাতিয়ার ধারালো করে চলো লেফ্‌ট-রাইট করতে করতে মিছিল করে গিয়ে শত্রুকে শেষ যুদ্ধে পৃথিবী থেকে হাপিস ক'রে দিই; শোষক সাবধান, আমরা এসে গেছি, তোদের সবকটাকে এক কোপে পেলে আর দু'কোপে নয়!" কিম্বা ধরা যাক এই রকম বাণী "নতুন দিনের সূর্য উঠছে নতুন আশার আলো নিয়ে, অতএব আর ভয় নেই, আমরা চাষী মজুর মিলে এবার আমাদের স্বপ্নের দিনটাকে আনবো শত্রুর জীবনের বিনিময়ে।" এই ধরণের বক্তব্য সুর বৈচিত্র্যে যতটা কাটে বক্তব্যের ধারে বা সজীবতায় মোটেই ততটা নয়, তাও আবার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মহলে, বিপ্লবের মূল চালিকা শক্তির কাছে নয়। অথচ দেখুন গদ্দারের গান, কি মধ্যপ্রদেশের ফাগু-রামের গান শ্রমজীবী মানুষের কাছে কত বেশী জনপ্রিয়। যাঁরা ছত্রিশগড় মুক্তি মোর্চার জন সমাবেশের ভিডিও ক্যাসেট দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে সমাবেশের মহিলা-শিশু-কিশোর-তরুণ-বৃদ্ধ সবাই, একত্রে ১৫।২০ হাজার মানুষ হাততালি দিয়ে যন্ত্রানুষঙ্গ বিহীন গায়ক ফাগুরামের সাথে গান গাইছে। এই তো সার্থক গণসঙ্গীত! আমরা ক'জন এরকম কটা গান লিখতে পেরেছি বা গাইতে পেরেছি।

তবু জনগণ আমাদের কাছেই আশা করেন। আমরাও আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আশা করি। তারা আমাদের ধারাবাহিকতাকে

বহন করে তাকে আরো বেশী বেশী গণমুখী করুন। আমাদের ভুল ও ব্যর্থতাগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে তাঁরা গণসঙ্গীতকে আরো শাণিত ও অব্যর্থ করুন। দেশজ উপাদান ও আঙ্গিককে আরো বেশী বেশী ক'রে আরো সার্থক ভাবে ব্যবহার করুন। মাও সে তুঙ-এর চিন্তাধারা অনুসরণ ক'রে, জনগণের জিনিষ জনগণের কাছ থেকে নিয়ে, তাকে সার্থক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের উপযুক্ত ক'রে, আবার জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিন। ঐক্যের সংকটজনিত বর্তমানের লজ্জার চেয়ে অনেক বড় আমাদের অতীতের নিঃস্বার্থ আত্মবলিদানের গৌরব। আমরা অতীতে যে ভুল করেছি, তা কোনও ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রস্বার্থের মোহে নয়। তাই সে ভুল এক মহান ভুল। ঐ নিঃস্বার্থ বলিদানের গৌরবান্বিত অধ্যায়ের জন্যই জনগণ আজো আমাদের কাছে ইতিবাচক কিছু প্রত্যাশা করেন। তাই, এই প্রজন্মের বিপ্লবী ধারার গণসঙ্গীত শিল্পী ও রচয়িতারা বিপ্লবের সূত্রধার বিবেক চারণ কবি হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করুন, সার্থক হোন।